UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

2012 INTERNATIONAL YEAR OF SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL

জুলাই-আগস্ট ২০১২ July-August 2012

২৪তম বর্ষ ৭ম ও ৮ম সংখ্যা Volume-XXIV, No. VII, VIII

পৃথিবীর জন্য তারকা থেকে বিদ্যুৎ

স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য সবুজ প্রযুক্তি

বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং পানি ও খাদ্য দূষণের ফলে বিশ্বব্যাপী যে জ্বালানি সঙ্কট সৃষ্টি এবং জলবায়ু ও ইকো ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য একটি হুমকি সৃষ্টি করেছে। জ্বালানির পরিকল্পিত চাহিদা এবং স্থিতিশীল, কার্বনমুক্ত ও সুলভ জ্বালানি সরবরাহের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনতে গিয়ে সমগ্র বিশ্ব বিপুল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। আজকের বিশ্বে

ইয়ং-জিল কিম

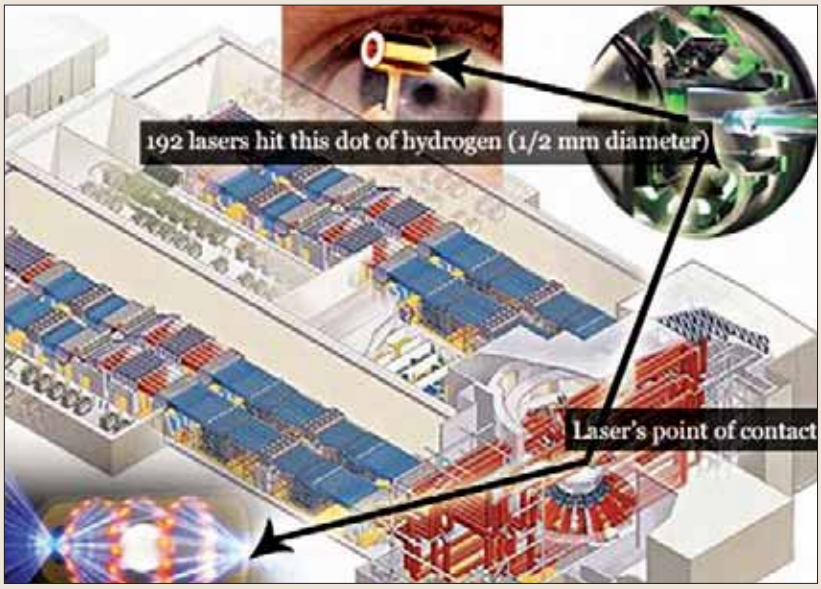

প্রাথমিক জ্বালানির মোট চাহিদার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মেটানো হয় জীবাশ্মজাত জ্বালানি দিয়ে, যা থেকে বায়ুমণ্ডলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড (গ্রিনহাউস গ্যাস) নির্গত হয়। সবসময় জ্বালানির ন্যূনতম যে চাহিদা থাকে সেই প্রয়োজন পূরণের মতো বেইসলোড, জ্বালানির বৈশ্বিক চাহিদা মেটানোর সামর্থ্য গড়ে তোলার জন্য নিরাপদ, পরিবেশগতভাবে স্থিতিশীল ও বাণিজ্যিক দিক থেকে সম্ভাবনাময় উৎস থেকে একটি সহজাত নিশ্চিত সরবরাহ ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রতিবেশের যে ধ্বংস হচ্ছে তার সর্বজনীন একটা বিরূপ প্রভাব পড়ছে সমগ্র গ্রহের ওপর এবং বিশ্বব্যাপী যে সচেতনতার প্রয়োজন তা হলো একটি বৈশ্বিক প্রকল্প হিসেবে সবুজ প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। সবুজ প্রযুক্তির বিকাশ পরিবেশ রক্ষা ও বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লালনের মিথস্ক্রিয় সুফল সর্বাধিক করার পথ তৈরি করবে। এই বিকাশ অর্জনের জন্য বিশ্বব্যাপী একটা গবেষণা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু কখনো ছিল না।

মানবজাতি এখন নতুন জ্বালানির সন্ধানে নিয়োজিত— সেই চূড়ান্ত, নবায়নযোগ্য, জ্বালানির উৎস যা পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগের অবসান ঘটানোর পাশাপাশি বিশ্বের প্রয়োজনীয় বেইসলোড বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করতে পারবে। সৌর, ফটোভোলটেইক, বায়ু ও পানি, বিদ্যুতের মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎসগুলো এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এক অপরিহার্য ভূমিকাই পালন করবে না, অধিকন্তু এজন্য অধিকাংশ দেশের বেইসলোড বিদ্যুতের বেশিরভাগ চাহিদা পূরণে বিপুল মজুদ সামর্থ্য বা প্রাপ্ত ভূমিরও প্রয়োজন হবে। প্রচলিত পারমাণবিক বিদারণ ধরনের জ্বালানির অনেক সুবিধা থাকলেও এজন্য সমৃদ্ধকরণ, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও উচ্চপর্যায়ের বর্জ্য মজুদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা ও বিস্তার-সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোর সমাধান প্রয়োজন। ফলে বিশ্বের বেশিরভাগ বেইসলোড বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ হবে বলে আশা করা যায় না।

জীবাশ্মজাত জ্বালানি পুড়িয়ে শূন্য কার্বন নির্গমন বিশিষ্ট জ্বালানি উৎসের

প্রধান বিকল্প হলো পারমাণবিক সংমিশ্রণ। দুটি হালকা আণবিক নিউক্লেই ফিউজ একত্রিত হয়ে একটি ভারি মূলাধার গঠন করলে পারমাণবিক সংমিশ্রণ সৃষ্টি হয়। নিয়ন্ত্রিত সংমিশ্রণ গবেষণায় নেতৃস্থানীয় ডিজাইনগুলোতে একটি বাষ্পচালিত টারবাইন চালানোর জন্য ব্যবহৃত সংমিশ্রণ বিক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত তাপের সাহায্যে একটি প্লাজমাকে চুম্বক বা লেজার ইনারশিয়াল পদ্ধতিতে অবরুদ্ধ করে রাখা, যা বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাহায্য করে।

পারমাণবিক সংমিশ্রণ জ্বালানির লোভনীয় সুফল থাকলেও লেজার ইনারশিয়াল উদ্যোগটি জ্বালানি নীতিতে বহুলাংশে উপেক্ষিত হয়েছে। এর কারণ হলো, আগামী কয়েক দশকে জ্বালানির প্রয়োজন যখন সবচেয়ে বেশি হবে, তখন জ্বালানি প্রক্ষেপণের প্রভাব বিস্তারে এই প্রযুক্তিকে অত্যন্ত অপরিপক্ব বিবেচনা করা হয়েছে। তবে কালিফোর্নিয়ার লিভারমোরে লরেন্স লিভারমোর ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে (এলএলএনএল) ন্যাশনাল ইগনিশন ফ্যাসিলিটি (এনআইএফ) ২০০৯ সালের মার্চে পরিচালিত পরীক্ষায় লেজার ইনারশিয়াল ফিউশন এনার্জির (লাইফ) সফলতা সবুজ প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীল উন্নয়নে সদা পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিতে একটি নতুন উদাহরণ যোগ করেছে।

বিশ্ব লেজার প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট

নিরাপদ, নিশ্চিত ও পরিবেশের দিক থেকে স্থিতিশীল জ্বালানির প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের পোহাঙে হ্যানডঙ গ্লোবাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (এইচজিইউ) লেজার সংমিশ্রণ জ্বালানির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি বিশ্ব নেটওয়ার্ক গঠনের মাধ্যমে ২০০৯ সালের মে মাসে বিশ্ব লেজার প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (জিআইএলটি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০১১ সালের ২ ডিসেম্বর পর্যাপ্ত, সহজাতভাবে নিরাপদ, স্বল্পমাত্রার কার্বন, ব্যয়-সাশ্রয়ী ও স্বল্প বর্জ্যের বেইসলোড বিদ্যুতের উৎসের জন্য লাইফভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিকল্পনা ও উন্নয়নে সহযোগিতা এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে এলএলএনএলের সঙ্গে এইচজিইউ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

এলএলএনএলে অবস্থিত লাইফের প্ল্যান্ট ডিজাইন এনআইএফের জ্যামিতি ও সম্পাদিত কাজের ভিত্তিতে করা হয়। ২০০৯ সালে সমাপ্ত এনআইএফ যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি দপ্তরের গড়ে তোলা এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক প্রকল্প। এনআইএফ নিট জ্বালানি সুফল দেয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে (লেজার বিম থেকে সম্ভরণের চেয়ে বেশি সংমিশ্রণ জ্বালানি উৎপাদন) এনআইএফের ১৯২টি লেজার বিম। এক সেকেন্ডের শতকোটি ভাগের এক ভাগ সময়ে একটি সংমিশ্রণ লক্ষ্যে প্রায় ২ মেগা জুল আলট্রা লেজার জ্বালানি পরিচালিত করতে পারে, যে অবস্থা কেবল গুরুত্বপূর্ণ তারকা ও অতিকায় গ্রহেই বিদ্যমান। সংমিশ্রণ দীপন অর্জনে সামর্থ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে এনআইএফ একটি নিরাপদ ও প্রকৃত সীমাহীন উৎস হিসেবে লেজার ইনারশিয়াল সংমিশ্রণের দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ ভিত্তি রচনা করেছে।

জিআইএলটি এবং এরআইএফের চলতি সহযোগিতামূলক গবেষণার মাধ্যমে বেইসলোড বিদ্যুৎশক্তির জন্য সহজাত নিরাপদ, স্বল্প কার্বন ও স্বল্প বর্জ্যের উৎস নিয়ে লাইফের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ডিজাইন ও উন্নয়ন কাজ এখন চলছে। একই সঙ্গে জিআইএলটি বর্তমানে ব্যবহৃত প্রযুক্তির সম্পূরক ও বিকল্প হিসেবে মূল প্রযুক্তিও অনুসরণ করছে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও পুনরাবৃত্তির উচ্চ হার সংবলিত একটি লেজার প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য জিআইএলটি তার নিজস্ব প্রযুক্তিতে ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। লেজার সংমিশ্রণের গবেষকরা এখন পর্যন্ত প্রয়োজনের লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার মতো পুনরাবৃত্তিমূলক যথেষ্ট উচ্চ হারের (>১০ এইচজেড) পাশাপাশি পর্যাপ্ত উচ্চ জ্বালানি ক্ষমতাসম্পন্ন (>৫০০ কেজে) একটি লেজার চালিকাশক্তির সমাধান খুঁজে পাননি। উচ্চ ক্ষমতার সমাধানের জন্য বহুবিধ রেজার বিম সংবলিত পদ্ধতি ব্যবহার করে উচ্চ হারের সমস্যার সমাধান আসতে পারে, যেমনটি হয়েছিল স্টিমুলেটর ব্রিলোইন স্ক্যাটারিং-ফেজ কনজুগেট মিররের ক্ষেত্রে। এ গবেষণাটি করেছেন কোরিয়া এডভান্সড ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে প্রফেসর হঙ জিন কঙ। এছাড়া উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন লেজার বিম তৈরির জন্য লেজার মাধ্যম কেবল বড় হলে চলবে না, বরং বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য উচ্চ ক্ষমতা ও পুনরাবৃত্তি হার অর্জনের লক্ষ্যে তার দ্রুত শীতল হওয়ার সামর্থ্যও থাকতে হবে। হাইব্রিড লেজার সংমিশ্রণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য উচ্চ পরিমাণের জ্বালানি তৈরির মতো উচ্চ হারে প্রজ্বালনের সামর্থ্য থাকতে হবে।

বর্তমান পর্যায়ে জরুরি যেসব প্রযুক্তি প্রয়োজন সেগুলো হলো লেজার ডায়োড, যা উচ্চ ক্ষমতা ও উচ্চ পুনরাবৃত্তিমূলক হারের লেজারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি অনবদ্য ও নিরাপদ চুল্লির নকশা ও উপযুক্ততার প্রযুক্তি। সৌভাগ্যের কথা হলো, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র সলিড স্টেট ইলেকট্রনিকস ও পারমাণবিক চুল্লি প্রযুক্তি উভয় ক্ষেত্রেই সুদৃঢ় অবস্থানে রয়েছে।

এছাড়া লেজার চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যয় কমিয়ে আনার লক্ষ্যে লেজার ডায়োড উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনেও জিআইএলটি কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে।

বর্তমান লেজার সংমিশ্রণে জ্বালানি কার্যকারিতা সর্বাধিক করার লক্ষ্যে সংমিশ্রণ বিক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত নিউট্রনগুলো একই সঙ্গে চারদিকের অতিগুরুত্বপূর্ণ বিদারণীয় বেষ্টনীতেও উচ্চ উৎপাদনশীল বিদারণ বিক্রিয়া ঘটাতে ব্যবহার করা যেতে পারে। কেবল সংমিশ্রণ থেকে যে সুফল অর্জন করা যাবে বলে লক্ষ্য নির্ধারিত থাকে তার তিন-চারগুণ নিট প্রাপ্তি ঘটতে পারে হাইব্রিড সংমিশ্রণ বিদারণ প্রক্রিয়া থেকে। এ ধরনের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সংমিশ্রণ চুল্লিতে ব্যবহার করার জন্য অতিগুরুত্বপূর্ণ বিদারণ বেষ্টনী তৈরি করা যেতে পারে। কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রধান রফতানি পণ্য শিল্প আণবিক বিদ্যুৎ শিল্পকে এই লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হতে হবে।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য শিক্ষা অতি গুরুত্বপূর্ণ: শিক্ষার মাধ্যমে নিয়মিত বিশেষজ্ঞ জোগান দেয়া, গবেষণার মাধ্যমে মর্মমূল প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উন্নয়নশীল দেশগুলোসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এই প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য অপরিহার্য সবুজ বিজ্ঞান ও লেজার প্রযুক্তির যেসব নতুন নতুন ক্ষেত্রের উদ্ভব ঘটছে, সেগুলো চর্চা করার উদ্দেশ্যে লেজার প্রযুক্তি ও সবুজ বিজ্ঞানের বিষয়ে মাস্টার্স ও ডক্টরাল ডিগ্রি করার জন্য ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর হ্যানডঙ গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব অ্যাডভান্সড গ্রিন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (এইচজিএসএজিএওই) খোলা হয়েছে। এইচজিএসএজিএওই জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনিভার্সিটি টোয়াইনিং অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং কর্মসূচি (ইউনেস্কো-ইউনি-টোয়াইন), এইচজিইউর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেগারশিপ ও জাতিসংঘের শান্তি সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়া-প্যাসিফিক সেন্টারের সঙ্গে অংশীদারিত্ব স্থাপন করেছে।

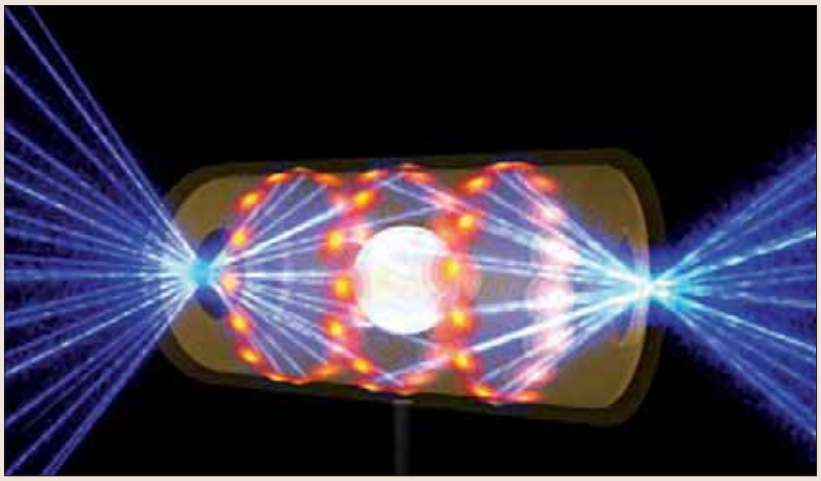

সামর্থ্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতিসংঘের একাডেমিক অভিঘাতের বৈশ্বিক চক্রকেন্দ্র

১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এইচজিইউ স্থিতিশীল উন্নয়নে সামর্থ্য গড়ে তোলার জন্য বিশ্ব শিক্ষার ওপর জোর দিচ্ছে। ফলে ২০০৭ সালের এপ্রিলে ইউনেস্কো এইচজিইউকে স্থিতিশীল উন্নয়নে সামর্থ্য গড়ে তোলার ইউনেস্কো-ইউনিটোয়াইন আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসেবে মনোনীত করে। ২০১১ সালের জানুয়ারিতে জাতিসংঘ নিচের তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে সামর্থ্য গড়ে তোলা বৈশ্বিক চক্রকেন্দ্ররূপে জাতিসংঘের একাডেমিক অভিঘাত (ইউএনএআই) হিসেবেও এইচজিইউকে নির্বাচিত করে—

১. স্থিতিশীল উন্নয়নে সবুজ প্রবৃদ্ধির জন্য বিশ্বে সহযোগিতামূলক গবেষণা;
২. উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্থিতিশীল উন্নয়নে সামর্থ্য গড়ে তোলার শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈশ্বিক উন্নয়ন ও উদ্যোগের জন্য শিক্ষা;
৩. স্থিতিশীল উন্নয়নের ইউনেস্কো-ইউনিটোয়াইনের সামর্থ্য গড়ে তোলার চলমান কর্মসূচির সঙ্গে অংশীদারিত্বমূলক ভিত্তিতে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জ্ঞানের ব্যবধান হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সমৃদ্ধির জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব।

পৃথিবীর জন্য তারকা থেকে বিদ্যুৎ

সবুজ প্রযুক্তির বিকাশ অর্জনের জন্য বিশ্বব্যাপী একটি গবেষণা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু কখনো ছিল না। এই বিশ্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এইচজিইউ সবুজ গবেষণা কর্মকাণ্ডে চক্রকেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে, এইচজিএস এজিএন্ডই আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ তৈরি করবে এবং ইউনেস্কো/ইউনিটোয়াইন আন্তর্জাতিক কেন্দ্র বিশ্ব সহযোগিতার নেটওয়ার্কের প্রসার ঘটাবে। এইচজিইউর ইউএনএআইর সামর্থ্য গড়ে তুলতে বিশ্ব চক্র কেন্দ্রের তিনটি বিষয় তিনটি কাঠামো হিসেবে ২০৩০ সাল নাগাদ চূড়ান্ত জ্বালানি উৎস গড়ে তোলার লক্ষ্যে জিআইএলটি তার প্রচেষ্টায় সহায়তা দেবে। বস্তুতপক্ষে সবুজ জ্বালানি উৎস হিসেবে বিকাশের লক্ষ্যে জিআইএলটি এমন একটি স্বচালিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন, পুনরাবৃত্তির উচ্চহারসম্পন্ন লেজার উদ্ভাবনের ওপর মনোযোগী হয়েছে, যা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে চূড়ান্ত লেজারচালিত ইনারশিয়াল সংমিশ্রণ জ্বালানির আলোক সংকেত হতে পারে। জিআইএলটি ২০৩০ সালের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের সরকারি সহায়তায় একটি পাইলট স্ট্যাবল অ্যাটমিক ফিউশন এনার্জি হাইব্রিড বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৫০০ এমডব্লু) নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করছে। জিআইএলটি এবং এলএলএনএলের বৈশ্বিক সহযোগিতামূলক গবেষণার ফলে জ্বালানির চূড়ান্ত, সীমাহীন, সবুজ, পরিচ্ছন্ন উৎস হিসেবে পৃথিবীর জন্য তারকা থেকে বিদ্যুৎ আনার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন অবশেষে সফল হতে পারে।

স্থিতিশীল নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

কিরাবো কাচিরা

বিগত দু'দশকের জনমিতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলো শহর ও নগর কেন্দ্রগুলোকে মানুষের প্রধান বসতিতে পরিণত করেছে। কেবল শহরগুলোতেই যে আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থার দ্রুত উন্নতি সম্ভব তা নয়, সেখানেই এ ধরনের পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। বিশ্বের উদীয়মান অর্থনীতির শহরগুলো বৈশ্বিক সমৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে থাকলেও এই গ্রহের সম্পদ দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাই উন্নয়নের প্রধান উপায় হিসেবে স্থিতিশীল নগরায়নের লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকার করা সদস্য রাষ্ট্র ও জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর জন্য এখন যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশের আর ক্ষতি না করে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ন্যায়সঙ্গত প্রবৃদ্ধি অর্জনের উপায় জরুরিভাবে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। নগরগুলোর পরিকল্পনা কীভাবে করা হয়, কীভাবে সেগুলো শাসন করা হয় এবং কীভাবে নাগরিকদের পরিসেবা দেয়া হয় তার মধ্যে সমাধানের অংশবিশেষ নিহিত রয়েছে। ব্যবস্থাপনা দুর্বল হলে নগরায়ন স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তবে স্বপ্ন ও অঙ্গীকার নিয়ে স্থিতিশীল নগরায়ন আমাদের ক্রমবর্ধমান বিশ্ব জনসংখ্যার অন্যতম সমাধান। কর্মসৃজন, আমাদের প্রতিবেশগত পদচিহ্ন হ্রাস ও জীবনমান উন্নয়নের প্রচেষ্টা সবচেয়ে ফলপ্রসূ তখনই হবে, যখন তা সামগ্রিকভাবে অনুসরণ করা হবে। ব্যাপক উন্নয়ন কাঠামোর মধ্যে স্থিতিশীল নগরায়নকে অগ্রাধিকার দেয়ার মাধ্যমে জ্বালানি, পানি ব্যবহার ও উৎপাদন, জীববৈচিত্র্য, দুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতি ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জের সমাধান একসঙ্গে করা যেতে পারে। এই যে সুযোগটি দেখা দিতে শুরু করেছে রিও+২০ সম্মেলনে তাকে স্বীকার করে নেয়া ও অনুমোদন দেয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

জলবায়ু পরিবর্তনের নগরযাত্রা

নগরায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো বিপজ্জনকভাবে সমকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। বিশ্ব জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগের বেশি ইতোমধ্যেই নগরবাসী এবং এক প্রজন্মের সামান্য বেশি সময়ের মধ্যে তা এক-তৃতীয়াংশে উন্নীত হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। শহর ও নগরগুলোতে ইতোমধ্যে বন্যা ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধাক্কা পড়ছে। বিশ্বের অনেক বড় বড় শহর ও নগর উপকূল প্রান্ত, নদী ও বন্যাপ্রবণ সমতল ভূমিতে অবস্থিত, প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাতে এগুলো সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে।

প্রাপ্ত সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক প্রমাণভিত্তিক পূর্বাভাসে দেখা যায়, আগামী দশকগুলোতে লাখ লাখ নগরবাসী বন্যা, ভূমিধস, চরম আবহাওয়া ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিতে পড়তে পারে। ক্রমবর্ধমান হারে অতি দরিদ্র ও প্রান্তজন অসমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এ সত্ত্বেও এসব দুর্যোগের অভিঘাত সামাল দেয়া ও নিজেদের রক্ষা করার মতো সামর্থ্য তাদের অতি সামান্য। উদাহরণ হিসেবে, ইউএন-হ্যাবিট্যাট-এর অতি সাম্প্রতিক আফ্রিকার নগর পরিস্থিতি শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে অন্তত ২০ কোটি আফ্রিকান ২০৫০ সাল নাগাদ বাস্তুচ্যুত হতে পারে, যা শহরগুলোর সামর্থ্য ও সম্পদের ওপর বিপুল চাপ সৃষ্টি করবে। এশিয়াও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত নয়। উদাহরণ হিসেবে, ২০১১ সালের বন্যায় থাইল্যান্ডের ব্যাংককে পাঁচশ'র বেশি লোক প্রাণ হারায় এবং অনুরূপভাবে আরো বেশি লোকের জীবিকার ক্ষতি হয়। উপকূলবর্তী সকল শহর এ ধরনের হুমকির সম্মুখীন বলে যেগুলোর জনসংখ্যা এক কোটির বেশি, সেগুলোর ক্ষেত্রে অভিঘাতও হবে বিপুল। অনুমান করা হয়েছে যে, খাপ খাওয়ানোর ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ না করা হলে নিউইয়র্কে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে তাতে কেবল উপকূলাঞ্চলই যে পানিতে তলিয়ে যাবে, তা নয়, বরং পাতাল পথ ব্যবস্থা, স্যানিটেশন সুবিধা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও কল-কারখানার ওপরও বিপর্যয়কর অভিঘাত পড়বে। ফলে সে সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হবে নগরীর অর্থনীতি।

স্থিতিশীল নগর উন্নয়নে উপযুক্ত পরিকল্পনা, নকশা ও বিনিয়োগ না হলে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক লোক কেবল জলবায়ু পরিবর্তন নয়, বরং হ্রাসকৃত অর্থনৈতিক

প্রবৃদ্ধি, জীবনমান ও বর্ধিত সামাজিক অস্থিতিশীলতার কারণেও নজিরবিহীন নেতিবাচক অভিঘাতের সম্মুখীন হতে থাকবে।

সবুজ নগরী?

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের অভিজ্ঞতাই যে কেবল যোগ হচ্ছে তা নয়, নগরগুলো স্থলভাগের শতকরা মাত্র ২ ভাগের দখল জুড়ে থাকলেও তারা অসমভাবে বিশ্বের শতকরা অন্তত ৭০ ভাগ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে অবদান রাখছে। নগরগুলোতে নিবিড় মানব কর্মকাণ্ড গ্রিনহাউস গ্যাসজনিত দূষণ বাড়ালেও তা শোষণে সাগর ও গাছপালার সামর্থ্য কমে যাচ্ছে। উন্নয়নশীল ও উন্নত উভয় দেশগুলোতেই অন্যান্যের মধ্যে পরিবহন ও নির্মাণে জীবাশ্মজাত জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, বৃহদায়তন শিল্পের দূষণ, বন বিনাশ ও ভূমির ব্যবহার পরিবর্তনের ফলে নগর প্রতিবেশগত পদচিহ্ন বেড়ে চলেছে।

বিত্ত-বৈভব এবং বৈশ্বিক পরিসেবা ও পণ্যের বর্ধিত চাহিদা পরিবেশের ওপর চাপ বৃদ্ধি করছে। জীবনযাত্রা ও ভোগের পছন্দগুলো নগরের আয়তন, কাঠামো ও ঘনত্ব গভীরভাবে বদলে দিচ্ছে। উন্নত দেশের কোনো কোনো শহর সঙ্কুচিত হতে থাকলেও উন্নয়নশীল বিশ্বের নগর কেন্দ্রগুলো দ্রুত ও বিপুলভাবে অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করছে। এর অর্থ হলো, গৃহসংস্থান, মৌলিক নগর পরিসেবা ও

ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বেড়ে চলেছে। নগর উপকণ্ঠে বসবাসকে প্রাধান্য দেয়া হলে গ্রামীণ ও নগর পরিবেশের ওপর তার একটা নেতিবাচক অভিঘাত পড়ে। এতে জনপরিবহনে অসুবিধা হয় এবং তা যানবাহনের মারাত্মক সংখ্যাধিক্য ঘটায়। ফলে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন বেড়ে যায়।

নগর কেন্দ্রগুলো জলবায়ু পরিবর্তনে কীভাবে অবদান রাখে তা পুরোপুরি বুঝতে হলে পরিবহন, ইমারত, তাপন ও শীতলকরণ ব্যবস্থা, শিল্প ও অন্যান্য নগর কর্মকাণ্ড কীভাবে নির্গমনে কাজ করে এবং সরাসরিভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটায়, তা বুঝতে হবে। কোনো নগরীর ভূবিজ্ঞান, জলবায়ু, ব্যাপনস্থলের ধরন ও অর্থনৈতিক ভিত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে জ্বালানি ব্যবহারের রীতি ও গ্রিনহাউস নির্গমনের আকৃতি দান করে।

গবেষণা থেকে কার্যব্যবস্থা

এসব সমস্যার অনেকগুলো সামাল দেয়া এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন ও শিল্প উৎপাদনে জীবাশ্মজাত জ্বালানির ব্যবহার থেকে বর্জ্য অপসারণ এবং ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার বিজ্ঞান ও বাস্তব জ্ঞান আমাদের রয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ কার্যকর ও মিলিতভাবে মোকাবেলা করার মাধ্যমে নগরগুলো এখানে একটা ভিন্নতা সৃষ্টি করতে পারে।

নগরগুলো মানব সভ্যতার বৃহত্তম অর্জনের রূপায়ণ। ইতিহাসজুড়ে নগর আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে, আমাদের কিছু মারাত্মক উদ্বেগের সমাধান এনে দিয়েছে। নগরগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা ও পরিবেশের ওপর সেগুলোর অভিঘাত লাঘবে আসঞ্জনশীল প্রশমন ও খাপ খাওয়ানোর কৌশল উদ্ভাবনে বিপুল অব্যবহৃত সুযোগ নিয়ে আসে।

ফলপ্রসূতার জন্য এসব কৌশলকে নগর পরিকল্পনা কাঠামোর মধ্যে সমন্বিত করতে হবে। কাজের চেয়ে বলা সহজ। নগরগুলো সম্ভবত মানবজাতির সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। আমাদের সম্মিলিত অবকাঠামো, গতিময়তা, জ্বালানি, গৃহায়ন, পানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রাতিষ্ঠানিক বদ্ধঘর ও খাতভিত্তিক উদ্বেগের মধ্যে কাজ করার জন্য আমাদের একটা নতুন উদাহরণ গড়ে

তুলতে হবে। একজন সাবেক মেয়র হিসেবে আমি প্রায়ই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি যে, যেসব লোকের আমরা সেবা করি তারা কতো গভীরভাবে সমন্বিত জীবনযাপন করে এবং তা কতো সহজে পেশাজীবীদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আমাদের চ্যালেঞ্জ হলো, সমভাবে সমন্বিত পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে স্পর্শকাতর সাড়া নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। কোনো সন্দেহ নেই যে, নগরগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত অনুকূলভাবে লাঘবে একটা অনবদ্য সুযোগ এনে দিতে পারে।

বেশ কয়েকশ' নগর ইতোমধ্যেই কার্যক্রম গ্রহণ করছে। প্রতিশ্রুতিশীল দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে অস্টিন, শিকাগো, ডারবান, হামবুর্গ, মাপুতো, মেক্সিকো সিটি, নানটেস, সাও পলো এবং চীন, কোরিয়া ও ফিলিপাইনের বেশ কয়েকটি নগর। ইউএন-হ্যাবিট্যাট-এর নগর ও জলবায়ু পরিবর্তন উদ্যোগ জলবায়ু সংক্রান্ত জরুরি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বর্তমানে আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকায় ২০টি দেশের শহরগুলোকে সহায়তা দিচ্ছে। নিঃসন্দেহে, সঠিক লক্ষ্যে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, তবে বিশ্ব ভিত্তিতে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টাই কাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

নগরায়ন ও উন্নয়ন— নগর সুযোগ

পরিবেশের নিশ্চিত অভিঘাত সত্ত্বেও নগরগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রশ্নাতীত যন্ত্র এবং শতকরা অন্তত ৮০ ভাগ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে অবদান রাখে। নগর কর্মসংস্থান করে এবং দারিদ্র্য মোচনের সুযোগ সহজে চিহ্নিত করে। আজ পর্যন্ত কোনো দেশই নগরায়িত করা ছাড়া তার নাগরিকদের উচ্চ জীবনমান অর্জন করতে পারেনি। অনেকে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোনো দেশই সফলভাবে নগরায়ন প্রবণতা থামাতে বা মোড় ফেরাতে পারেনি। জলবায়ুবান্ধব নগর পরিকল্পনা ও ডিজাইন কেবল নগরবাসীদের নিরাপত্তার জন্যই যে প্রয়োজনীয়তা নয় বরং তা কোনো দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের সুরক্ষার প্রয়োজনকেও স্বীকার করে। অবকাঠামো ও পরিসেবার সুরক্ষা জীবিকার নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসারে সহায়তা করে।

নগর পরিকল্পনা, নকশা ও উন্নয়ন এমনভাবে করতে হবে যাতে পরিবেশের ওপর তার অভিঘাত কম পড়ে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব তা সামলে উঠতে পারে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। সুপরিকল্পিত পরিসেবা ও অবকাঠামো সংবলিত সুবিন্যস্ত নগর ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পরিবহন ও অন্যান্য পরিসেবার ব্যয় হ্রাস করে। বিনিময়ে এটা উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করে।

সবুজ অর্থনীতি শরিকানামূলক সমৃদ্ধির নতুন নতুন সুযোগ নিয়ে আসে। এটা কেবল দারিদ্র্য মোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, বলিষ্ঠ পানি ব্যবস্থাপনা ও স্থিতিশীল নগরের মতো মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনেই অবদান রাখবে না, অধিকন্তু তা কর্মসংস্থান ও উন্নয়নেও উদ্দীপনা জোগাতে পারে।

জাতীয় ও নগর পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমাজ, ব্যবসায়ী মহল ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অপরিহার্য খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকার করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন কাঠামো ও অর্থায়ন ব্যবস্থায় একটা প্রান্তিক ভূমিকা পালন থেকে আমরা আজ সবার জন্য একটা স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ অর্জনের সুযোগ গ্রহণ ও নগরীর সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারি।

মানব বসতির জন্য জাতিসংঘ কর্মসূচি ইউএন-হ্যাবিট্যাট-এর ওপর ব্যাপক নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে শহর ও নগরের স্থিতিশীল উন্নয়ন এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে।

ক্ষুধা : একটি জাতীয় নিরাপত্তা হুমকি

খাদ্য নিরাপত্তা কথাটি মাত্র ১৬ বছর আগে উদ্ভাবিত হলেও সেই প্রাচীনকাল থেকেই দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে মানবজাতি লড়াই করছে। 'সকল মানুষের সকল সময়ে একটা সুস্থ ও সক্রিয় জীবনযাপনের মতো পর্যাপ্ত, নিরাপদ, পুষ্টিকর খাদ্য লাভের সুযোগ থাকে,' তখন খাদ্য নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকে বলে খাদ্য নিরাপত্তার যে ধারণার ওপর বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলন ১৯৯৬ সালে ঐকমত্যে উপনীত হয়েছিল, তা ক্ষুধা ও অপুষ্টিবিরোধী প্রচেষ্টায় এক

আবিদ সুলেরি

নতুন দৃকশক্তি দান করেছে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, খাদ্য নিরাপত্তা বহুমাত্রিক এবং তা বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, জাতীয়, উপ-জাতীয় ও পরিবার পর্যায়ে মানুষকে প্রভাবিত করে। এটা নিজেকে বিভিন্নভাবে তুলে ধরে, যেমন দীর্ঘস্থায়ী, তীব্র ও স্বল্পস্থায়ী। এছাড়া খাদ্যে নিরাপদ হওয়ার জন্য নারী, পুরুষ, শিশু ও প্রবীণদের বিভিন্ন চাহিদা থাকে।

চরম দারিদ্র্য কমিয়ে আনা এবং সে উদ্দেশ্যে ২০১৫ সালকে সময়সীমা হিসেবে নির্ধারিত করে পর্যায়ক্রমিক লক্ষ্য ধার্য করে মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো নামক নতুন বিশ্ব অংশীদারিত্ব খাদ্য নিরাপত্তার কারণকে নতুন গতি দেবে বলে আশা করা হয়েছে। তবে পথপরিক্রমায় ১২ বছর পেরিয়ে গেলেও ক্ষুধাপীড়িত মানুষের সংখ্যা ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনার এমডিজি ১-এর ১-সি লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি অধিকাংশ অঞ্চলে এখনো হতাশাব্যঞ্জক ও রুদ্ধ হয়ে আছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিকাশরুদ্ধতা ও দৌর্বল্য বিদ্যমান, যেখানে চারটির মধ্যে একটি শিশু কম ওজনের।

এই আতঙ্কজনক অবস্থার কারণগুলোর প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভিন্নতা আছে। খাদ্য নিরাপত্তা আছে কিনা তা নির্ধারণের তিনটি পূর্বশর্ত আছে : উৎপাদন, আমদানি, সাহায্য, দেশের অভ্যন্তরে স্থানান্তরের মাধ্যমে খাদ্যের

বাস্তব প্রাপ্যতা, খাদ্য লাভে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক সুযোগ ও খাদ্য দেহে শোষিত হওয়া।

স্থানীয় উৎপাদনের অভাব, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ, মৌসুমগত তারতম্য, পানির ঘাটতি, দুর্বল অবকাঠামো, গুদামজাত করার অপ্রতুল সামর্থ্য, মজুদদারি বা আইনগত সমস্যায় ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উভয় পর্যায়ে খাদ্যের বাস্তব প্রাপ্যতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। দারিদ্র্য, সম্পদের অভাব, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও জীবিকা উপার্জনের সুযোগ হারানোর মতো কারণেও অবশ্য খাদ্য লাভের আর্থ-সামাজিক সুযোগের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। এছাড়া হ্রাসকৃত আর্থিক রক্ষা ব্যবস্থা, সাক্ষরতার নিম্ন হার, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের মতো সামাজিক রীতি ও সুষম খাদ্য গ্রহণের সুফল সম্পর্কে সচেতনতা না থাকার কারণে ভর্তুকি দেয়া মূল্যে খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গতিপূর্ণ সরবরাহের অভাবে পরিবারের ভেতর সম্পদ বণ্টনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

অন্যদিকে যেসব কারণে দেহে খাদ্য শোষিত হওয়া ব্যাহত হয়, তার মধ্যে রয়েছে পরিষ্কার খাবার পানির অভাব, অপ্রতুল স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশন সুবিধা, সাক্ষরতার নিম্ন হার এবং মৌলিক পরিসেবার জোগান নিশ্চিত করার পক্ষে সহায়ক জনখাতের উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যয় করার মতো সরকারের আর্থিক রক্ষা ব্যবস্থার অভাব। দ্রুত ছড়িয়ে পড়া বিশ্ব খাদ্য সঙ্কটে আরো বিভিন্ন কারণ অবদান রাখছে।

মানবিক এবং/বা উৎপাদনের বিষয়

বিশ্বের ক্ষুধা অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জনে মন্থর ও দ্রুতগতির অন্যতম কারণ হলো, আমাদের বেশিরভাগ নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রণেতারা খাদ্য অনিরাপত্তাকে হয় একটা মানবিক বিষয় এবং/বা একটা উৎপাদনের বিষয় বলে মনে করেন। খাদ্য অনিরাপত্তাকে মানবিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করলে অবশ্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতি, বদান্যতা, খাদ্য সাহায্য, জরুরি খাদ্য সরবরাহ ও অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য জরুরি আবেদনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কোনো কোনো অবস্থায় এসব ব্যবস্থা

এরপর পৃষ্ঠা-১০

নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠিত

১৮ জুলাই, ২০১২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার মিলনায়তনে গত ১৮ জুলাই নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে এক সেমিনারের আয়োজন করে। শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে আসন অলঙ্কৃত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক কামালউদ্দিন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা। শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডালিম চন্দ্র বর্মণ সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন তথ্য কেন্দ্রের নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে নেলসন মেন্ডেলার ওপর ভিডিও প্রদর্শন এবং কবিতা আবৃত্তি করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

কাজী আলী রেজা, অধিকর্তা, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র

অধ্যাপক কামাল উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ডালিম চন্দ্র বর্মণ, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ

রফিকুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ

একজন যুব প্রতিনিধি বক্তব্য রাখছেন

অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

১২ আগস্ট, ২০১২

আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র গত ১২ আগস্ট একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক সমন্বয়কারী ক্রিস্টা রাডার এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (জাতিসংঘ) সাইদা মুনা তাসনিম। মাউন্ট এভারেস্ট বিজয়ী নিশাত মজুমদার ও এমএ মুহিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ ছাত্র ও যুব সমিতির ট্রাস্টি সদস্য ডা. তাওফিক জোয়ারদার ও সৈয়দ মো. শাইখ ইমতিয়াজ এবং চ্যানেল আই ইয়ুথ আইকন সামিয়া সাঈদ বক্তব্য রাখেন। আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে শতাধিক যুব প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সমন্বয়কারী ক্রিস্টা রাডার বক্তব্য রাখছেন

এভারেস্ট বিজয়ী ও অতিথিদের গ্রুপ ছবি

গোলটেবিল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

যুব প্রতিনিধিদের সাথে এভারেস্ট বিজয়ীদ্বয়

পৃষ্ঠা-৭-এর পর

গুরুত্বপূর্ণ হলেও এগুলো খাদ্য নিরাপত্তার ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সামাল দিতে পারে না, কিংবা স্থিতিশীল খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না।

অনুরূপভাবে খাদ্য অনিরাপত্তাকে কেবল উৎপাদনের একটা বিষয় হিসেবে মনে করলে তাও আবার খাদ্য নিরাপত্তার মাত্র একটি দিক বাস্তব প্রাপ্যতা তুলে ধরে। ভারত, পাকিস্তান ও লাতিন আমেরিকার অনেক দেশ, যেগুলো খাদ্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত ছিল, বিগত বছরগুলোতে সেসব দেশে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও খাদ্য অনিরাপত্তা বেড়ে গেছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির তথ্য অনুযায়ী, ২০১০ সালে পাকিস্তানে ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় প্রধান খাদ্যশস্য হিসেবে বিবেচিত গমের ব্যবহার শতকরা ১০ ভাগ কমে যায়। কেবল খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্য অনিরাপত্তা বিষয়কে সামাল দেয়ার চেষ্টা কখনো কখনো এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে স্থিতিশীল উপায়ে খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে কিনা। উত্তরে কৃষি উৎপাদনে ভর্তুকির বিরুদ্ধে বিতর্ক এবং দক্ষিণের পরিবেশের ওপর সবুজ বিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব এই বিষয়টির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, অধিক উৎপাদনের প্রচেষ্টার সঙ্গে স্থিতিশীলতার নীতিমালার রক্ষা কীভাবে হবে।

স্থিতিশীলতার নীতিমালার মাধ্যমে বর্ধিত উৎপাদন অর্জিত হয় বলে তা কোনো সমস্যা নয়। তবে যে বিষয়টি উদ্বেগের, তা হলো সবার জন্য সকল সময়ে প্রাপ্ত খাদ্যের আর্থ-সামাজিক সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য অতি সামান্য কিছু করা হচ্ছে। খাদ্য (অ)নিরাপত্তার এটা সবচেয়ে বড় উপেক্ষিত বিষয়।

শাসন এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব

খাদ্য লাভে অর্থনৈতিক সুযোগের অভাবের অনেকগুলো কারণ রয়েছে। সরবরাহের ক্ষেত্রে, খাদ্যমূল্যের অস্থিরতার প্রধান কারণ হলো অদক্ষ শাসন ও বাজার বিকৃতির চর্চা। খাদ্যমূল্য স্ফীতির কয়েকটি কারণ হলো, যেসব দেশে শাসন ব্যবস্থা দুর্বল সেসব দেশে অদক্ষ বাজার, কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি,

জ্বালানি মূল্যবৃদ্ধির কারণে পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি, ভৌত অবকাঠামোর ক্ষতির দরুন খাদ্যপণ্যের সীমিত সরবরাহ, বিশেষ করে প্রধান খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে মজুদদারি, আঁতাত ও ব্যবসায়ীদের অসাধু আঁতাত এবং প্রতিবেশী দেশে খাদ্যশস্য ও জীবন্ত প্রাণী পাচার। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নততর শাসনের মাধ্যমে এর সবগুলো বিষয়ই সামাল দেয়া সম্ভব।

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে আবার ক্ষুধা ও খাদ্য অনিরাপত্তার হার বেশি, সেসব দেশে নিয়ন্ত্রিত বা অনিশ্চিত, বাস্তব খাদ্য সরবরাহ আতঙ্কমূলক ক্রয় বাড়িয়ে দেয়। যাদের ক্রয়ক্ষমতা থাকে তারা উচ্চতর মূল্যে হলেও আশু প্রয়োজনের বাইরে ক্রয়ের চেষ্টা করে। এটা মজুদদারদের উচ্চতর মূল্যে বিক্রয়ে আরো উৎসাহিত করে এবং সরবরাহ স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত এই অশুভ চক্র চলতে থাকে।

এমডিজি অর্জনে সদস্য দেশগুলোর দেয়া অগ্রগতি রিপোর্টের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, অধিক খাদ্য উৎপাদন, উন্নততর খাবার পানি সরবরাহ (অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের যে নিরাপদ খাবার পানি প্রয়োজন, অবশ্যই তা নয়), মারাত্মক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য অশোষণ উন্নয়নে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বে সামষ্টিক পর্যায়ে অনেক চেষ্টা চলছে; কিন্তু খাদ্যের আর্থ-সামাজিক সুযোগ উন্নয়নে কোনো আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব নেই। ক্ষুধা বিতাড়নে আমাদের প্রচেষ্টার মধ্যে এটা হলো দুর্বলতম সংযোগ আর নিরাপত্তা অর্জনে এটারই রয়েছে বৃহত্তর সংশ্লেষ। নিরাপত্তার ব্যক্তি, জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক— যে চারটি পর্যায় রয়েছে তার প্রতিটিই পারস্পরিকভাবে অবর্জনকর এবং একে অপরের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয়। এই পৃথিবীর একশ' কোটির বেশি লোক নিত্য খাদ্যাভাব এবং ব্যক্তিগত অনিরাপত্তার অভিজ্ঞতা অর্জন করছে, আর এর ফলেই তাদের মধ্যে চরম ও অসাধারণ আচরণের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার গ্রন্থিত তথ্যে দেখা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশের মানুষ কীভাবে তাদের খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে এবং কীভাবে কম পছন্দের খাদ্যে চলে গেছে। ব্যক্তিগত অনিরাপত্তায় জর্জরিত মানুষের চরম ও অসাধারণ আচরণ অনুধাবনের জন্য কেউ যে কোনো একটি উন্নয়নশীল দেশের যে কোনো একটি সংবাদপত্র পড়ে দেখতে পারেন। তাদের কেউ কেউ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহের মতো মৌলিক সুযোগ-সুবিধার জন্য প্রতিবাদ জানায় এবং এর মধ্য দিয়ে তারা এমন ধরনের কাজের আশ্রয় যা সহিংসতায় মোড় নিতে পারে। অথবা তারা তাদের কিডনি, এমনকি সন্তান বিক্রয়েও বাধ্য হয়, কেউ কেউ চুরি, তস্করবৃত্তি, ডাকাতি ও মুক্তিপণের জন্য অপহরণের মতো বিভিন্ন সমাজবিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়ে।

কেউ কেউ ঘরের নারীদের পতিতাবৃত্তি ও সন্তানকে শিশুশ্রমে বাধ্য করে এবং কেউ আত্মহত্যা ও/বা পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে কেউ কেউ জঙ্গি গ্রুপগুলোর ফাঁদে আটকা পড়ে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আত্মঘাতী হয়। এসব আচরণ কেবল অসহনশীলতা ও সহিংসতাই বাড়ায় না, অধিকন্তু সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতার পথও সুগম করে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে। এর ফলে প্রতিরক্ষা ও সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। এ পর্যায়ে খাদ্য অনিরাপত্তা শান্তি, সামাজিক সুবিচার ও অর্থনৈতিক কল্যাণের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে স্থিতিশীল উন্নয়নকে বিপন্ন করে। তাই এখন ভবিষ্যতের পথ কোনটি? প্রথমত, এ পরিস্থিতিতে দৃষ্টান্তে এমন একটা পরিবর্তন আনতে হবে যাতে ব্যক্তির ক্ষুধাকে জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি মনে করতে হবে। দৃষ্টান্তের এই পরিবর্তনের ফলে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বেশি সম্পদ প্রবাহিত হবে। এতে সরকারি ব্যয়ের অগ্রাধিকারও বদলে যাবে, জাতীয় প্রতিরক্ষার চেয়ে সামাজিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং এ ধরনের ব্যয়ের যে সুফল তা রাষ্ট্র নয়, ব্যক্তিমানুষ পাবে। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মতো অস্থিতিশীল ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্ধিত খাদ্য উৎপাদন অর্জন করা যাবে না। খাদ্য উৎপাদন ও পরিবেশের স্থিতিশীলতার মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

তৃতীয়ত, আমাদের জাতীয় নীতি প্রণেতাদের অস্বীকৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে যে, খাদ্য অনিরাপত্তার বিষয়টি রয়েছে। এরপর তাদের বিশেষ করে শিশু, গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদাত্রী মায়ের জন্য লক্ষ্য নির্ধারিত ত্রাণ দেয়ার জন্য সামাজিক রক্ষা ব্যবস্থা জোরালো করতে হবে। যারা খাদ্যের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্য কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ বা কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আকারে বিশেষ কর্মসূচিও নিতে হবে। পরিশেষে, যেসব দেশ খাদ্যে উদ্বৃত্ত তাদের কাছ থেকে এ শিক্ষা নিতে হবে যে, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে শাসনের উন্নতি না হলে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব ও বৈশ্বিক পরিচালকমণ্ডলী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কিছু করতে পারবে না।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী

৯ আগস্ট ২০১২

আদিবাসী জনগণের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণা গৃহীত হওয়ার গত পাঁচ বছরের মধ্যেই বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ব্যক্তিবর্গ প্রথাগত ও নতুন গণমাধ্যমগুলো ব্যবহার করে তাদের জীবনাচার ও অধিকার বিষয়ক কথাগুলো বলার সুবিধা নিচ্ছে।

এ বছরের আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের বক্তব্য হলো 'আদিবাসীদের অধিকার সচেতনতায় গণমাধ্যম'। কমিউনিটি রেডিও এবং টেলিভিশন থেকে শুরু করে ফিচার ফিল্ম ও ডকুমেন্টারি, ভিডিও শিল্প ও সংবাদপত্র থেকে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, এসব শক্তিশালী উপকরণগুলো ব্যবহার করে আদিবাসী জনগণ মূলধারার উপচার মোকাবেলা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ এবং বৈশ্বিক সংহতি জোরদার করছে। আদিবাসী মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে এবং অবাস্তব ও ভুল ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে তারা তাদের নিজস্ব গণমাধ্যমও গড়ে তুলছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কীভাবে চরম অবিচার ও সীমাহীন বৈষম্যের সাথে লড়াই করছে সেসব ঘটনা আদিবাসীদের কণ্ঠে পুনরায় ধ্বনিত হচ্ছে এবং তারা তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, আধ্যাত্মিকতা ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণে তাদের সম্পদ ও অধিকারের স্বপক্ষে জোর প্রচারণা চালাচ্ছে। আদিবাসীদের অভিজ্ঞতা সম্পৃক্ত করে না—তারা এমন উন্নয়ন মডেলের বিকল্পের প্রস্তাব দিচ্ছে। তারা পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক উপলব্ধিকে এগিয়ে নিচ্ছে, যা দারিদ্র্য ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজের একটি পূর্বশর্ত।

এই আন্তর্জাতিক দিবসে, আদিবাসী জনগণ ও তাদের গণমাধ্যমসহ জাতিসংঘ ঘোষণার পূর্ণ বাস্তবায়নে সহায়তা করতে, আমি জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর পূর্ণ সহায়তার অঙ্গীকার করছি। আদিবাসী জনগণের সম্ভাবনা, অগ্রাধিকার ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি ও তা বজায় রাখতে আমি প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র ও মূলধারার গণমাধ্যমকেও আহ্বান জানাই।

আদিবাসী ও আদিবাসী গণমাধ্যম, বিশেষ করে নতুন মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে চলুন আমরা সেতুবন্ধ তৈরি করি ও সত্যিকারের আন্তঃসাংস্কৃতিক বিশ্ব গড়ে তুলি, যেখানে বৈচিত্র্যকে আলিঙ্গন করা হয় এবং যেখানে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য শুধু সহাবস্থানই করে না, বরং তাদের পারস্পরিক অবদান ও সম্ভাবনা তাদের অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়।

পানি ব্যবস্থাপনা স্থানীয় পর্যায়ে শুরু হয় কেন?

মার্গারেট ক্যাটলে কারলসন

পানির ব্যবহার সর্বব্যাপী। সব ধরনের জীবন এবং প্রকৃতপক্ষে সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য পানি অপরিহার্য। জাতিসংঘ ঘোষণা করেছে যে, নিরাপদ ও পরিষ্কার খাবার পানি এবং স্যানিটেশনের নির্ভরযোগ্য সুযোগ লাভের মানবাধিকার বিদ্যমান রয়েছে, অন্যান্য গৃহস্থালি প্রয়োজনসহ যাতে পানির সব ব্যবহারের প্রায় ৭ থেকে ১০ শতাংশ ব্যবহার হয়। আমাদের অনেক কাজে পানির প্রয়োজন হয় : পরিবহন, পৌর ও শিল্প কাজে ব্যবহার (শতকরা ১০ থেকে ৩০ ভাগ), কৃষি (শতকরা ৭০ ভাগের বেশি), বিনোদন, ধর্মীয় ও আরো অনেক কাজে।

পানির ক্ষেত্রে 'স্থানীয়' বলতে কী বোঝায়?

যেসব গ্রাম ও পল্লী এলাকায় গ্রামীণ মানুষের বসবাস, স্থানীয় বলতে সচরাচর সেসব গ্রামকে বোঝানো হয়। কিন্তু এখন শতকরা ৫০ ভাগের বেশি মানুষ শহরবাসী, সে সঙ্গে দৈনিক আরো ২ লাখ লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে শহরমুখী হচ্ছে বলে স্থানীয় পর্যায় বলতে অনেকটাই শহর বোঝায়, কোনো কোনো ছোট ও মাঝারি আয়তনের দেশে, স্থানীয় বলতে জাতীয় পর্যায়ও অন্তর্ভুক্ত হবে, যদি তা নিয়ম-নির্ধারণী পর্যায় হয়। তাই অযথার্থ হলেও শব্দটির সঙ্গে অনেক সময় পরিসেবা কে দেবে তা এবং অর্থায়নের বিষয়টিও চলে আসে। বেশিরভাগ দেশেই দায়িত্বটি দেয়া হয় আঞ্চলিক বা স্থানীয় পর্যায়ে : সেনেগালের মতো অল্প কয়েকটি দেশ জাতীয় ভিত্তিতে পানি পরিসেবা চালানোর চেষ্টা করছে। খুব বড় বড় দেশের আঞ্চলিক, রাজ্য বা প্রাদেশিক ও পৌর পর্যায়ে বিধিবিধান ও বিনিয়োগ থাকবে।

সব পর্যায়েই একটা বিষয় হলো সরবরাহ। স্থানীয় পানি সরবরাহ হয় কোনো নদী কিংবা নদীর উৎস সংবলিত ভূগর্ভ থেকে। বিশ্বের প্রায় ৭০টি প্রধান নদ-নদী থেকে ইতোমধ্যেই অতিরিক্ত পানি নিষ্কাষিত করা হয়ে গেছে; আরো সোজা-সাপটা বলতে গেলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এতো বেশি পানি নিয়ে যাচ্ছে যে, নদী আর সাগরে পৌঁছাতে এবং ইকোব্যবস্থাকে লালন করতে পারছে না। পানি নিয়ে কাব্য চমৎকার হলেও পানির সব ব্যবহারের জন্য অবকাঠামো প্রয়োজন, যার জন্য প্রাথমিক ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় রয়েছে। রোগব্যাধি, খাদ্যাভাব ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কমে যাওয়ার সবগুলোর মূলেই রয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা ও পানির অবকাঠামোর ঘাটতি।

তাই সকল পর্যায়ে, বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে অর্থ ও অর্থায়নের বিষয়টি জড়িত রয়েছে। পরিশোধের ধরন হতে পারে শুল্ক, কর বা স্থানান্তর করার মতো কোনো সংস্থা থাকলে তা স্থানান্তর করা পানির অবকাঠামোর জন্য অর্থ ব্যয় হয় : অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার (ওইসিডি) হিসেবে, খাবার পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত ও মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর (এমডিজি) নতুন

অবকাঠামোর চাহিদা পূরণে বিশ্বের দক্ষিণে বছরে ১ হাজার ৮শ' কোটি ডলার প্রয়োজন, আর বিদ্যমান অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ও মানোন্নয়নে প্রয়োজন পাঁচ হাজার চারশ' কোটি ডলার।

পানি ব্যবস্থাপনা স্থানীয় পর্যায়ে কেন?

কোনো দেশ, অঞ্চল বা নগরে পানির ব্যবস্থাপনা যেভাবেই হোক না কেন, তা স্থানীয় এবং তার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ধর্ম, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, মাটির বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক ও জলবায়ু ধরনের সঙ্গে পানি বিজ্ঞানের বাস্তবতা (বৃষ্টিপাতের ধরন, নদ-নদী, হ্রদ ও ভূগর্ভস্থ পানি ও আবহাওয়ার ঘটনাবলি)।

স্থানীয় সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বৈচিত্র্য বিস্তর ভিন্নতা সৃষ্টি করে। খরার মতো পানির সমস্যাগুলো সমগ্র বিশ্বে একই ধরনের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দিলেও অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত অভিঘাতের ক্ষেত্রে তার ফলে থাকে বিপুল ভিন্নতা : অস্ট্রেলিয়ায় সাত বছর ধরে খরায় প্রকৃতপক্ষে কেউ অনাহারে থাকেনি, কিংবা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনও কমেনি, অথচ গত বছর সোমালিয়ায় অনেক প্রাণহানি ঘটেছে। অনেক বেশিসংখ্যক দেশে খরা জিডিপির বিপর্যয় ঘটায়। স্থানীয় প্রস্তুতি ও সাড়া অনুযায়ী একই মাত্রার বন্যায় মৃত্যু ও দুর্যোগের পরিণতি হয় বিভিন্ন। উদাহরণ হিসেবে, বিগত এক দশকে বাংলাদেশ বন্যার ক্ষেত্রে সাড়ার সামর্থ্য উল্লেখযোগ্য মাত্রায় উন্নত করেছে। ফলে একদা মৃত্যুর যে হার ছিল হাজার হাজার তা বহুলাংশে স্থানীয় পর্যায়ে সামর্থ্য গড়ে তোলার ফলে বর্তমানে কয়েকশতে নেমে এসেছে। পানির যে পাম্প এক পরিস্থিতিতে বছরের পর বছর কাজ করে, সেই একই পাম্প অন্য পরিস্থিতিতে মাত্র কয়েকদিন চলতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়ার মধ্য উপত্যকায় তুলার প্রতিটি ঝোপে যে পরিমাণ পানি দেয়া হয় তা মিসর ও সমগ্র বিশ্বের তুলনায় নাটকীয়ভাবে কম। খরা মোকাবেলায় প্রস্তুতির পর্যায়, জাতীয় সাড়া, সহযোগিতার মাত্রা, বিধিবিধানের প্রয়োগ, পরিবর্তনের ইচ্ছা বা সামর্থ্য, আয়ের প্রভাব, প্রাণ ও গবাদিপশু হানি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অভিঘাতে সমাজ থেকে সমাজে নাটকীয় তারতম্য হয়।

তাই প্রতীয়মান হয় যে, স্থানীয়ভাবে খাপ না খাইয়ে পানির সমাধান সচরাচর গ্রহণ করা যায় না। জ্ঞান, উপাত্ত, ধারণা ও প্রযুক্তির বিনিময় অপরিহার্য। উপাত্ত সংগ্রহের পন্থা, প্রযুক্তি, পদ্ধতি বিষয়ক তথ্য, কারিগরি তথ্য ও বিল তৈরির পদ্ধতির চর্চা সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা করা হলেও অন্যদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কাজগুলো করা হলে তার মূল্য বেড়ে যাবে। বিশ্ব পানি ব্যবস্থাপনা অংশীদারিত্বের পানি সংক্রান্ত নীতির জন্য একটি হাতিয়ার বাক্স রয়েছে। ২০১২ সালের স্টকহোম পুরস্কার বিজয়ী আন্তর্জাতিক পানি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কৃষি কাজে পানির ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান বিনিময়ে কাজ করছে। জাতিসংঘ মহাসচিবের পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত উপদেষ্টা বোর্ডের ধারণার ভিত্তিতে সৃষ্ট ইউএন-হ্যাবিট্যাট বিশ্ব পানিচালক অংশীদারিত্বের যে উদ্দেশ্য, সংক্ষেপে তা হলো অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উপযোগগুলোর যে জ্ঞান রয়েছে তা বিনিময়ে সহায়তা করা। আমি এ বোর্ডের একজন সদস্য। অত্যন্ত কার্যকর পানি পরিসেবা দাতার অনেকেই স্থানীয় সামাজিক গ্রুপ ও বেসরকারি সংস্থা।

সেবার আওতাবহির্ভূত লোকদের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বিষয়গুলো কী?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উত্তর কেবল স্থানীয়ভাবেই দেয়া যেতে পারে।

স্থানীয় ক্ষমতার কাঠামো পানি সেচের অগ্রাধিকার অনির্ধারণ করে এবং তাই এটা ভূগর্ভস্থ পানি ও ডিজেলনির্ভর পানির জন্য বিরাট অবলম্বন। খাবার পানির কথা বলতে গেলে, 'পানিবিহীন' ১২০ কোটি লোকের বাগাড়ম্বর এই ধারণায় উপনীত হতে পারে যে, লোকের আদৌ কোনো পানি নেই। বাস্তবে পানিবঞ্চিত লোকদের সোজাসুজি মৃত্যুর মধ্যে ঠেলে দেয়া হবে। প্রত্যেকেরই পানি আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা মানব স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য পরিষ্কার, লভ্য ও পর্যাপ্ত নয়। উচ্চ অগ্রাধিকারভিত্তিক না হলেও স্বাস্থ্য ও মর্যাদার নিশ্চয়তা বিধায়ক—স্যানিটেশনের অবস্থা আরো নিচে। ২৫০ কোটি লোক স্যানিটেশন ছাড়াই বেঁচে আছে।

তাই প্রশ্ন হলো, ১২০ কোটি লোকের আরো ভালো মানের ও সহজে পাওয়ার মতো পানি নেই কেন? পানি ও স্যানিটেশন অনেক ক্ষেত্রেই কেন কম রাজনৈতিক অগ্রাধিকারে ভোগে? উত্তর আছে অনেক—নিয়ন্ত্রিত পৌর পানি কোনো কোনো জাতিগত শ্রেণি বা ঘোষিত পৌর এলাকার বাইরে বসবাসরত লোকজন পায় না। পানির ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহায়তার অগ্রাধিকার অপেক্ষাকৃত কম। লোকে তাদের অপ্রতুল সম্পদ টেলিফোন, পরিবহন, বিদ্যুৎ বা বিনোদনের মতো অন্যান্য পরিসেবায় ব্যয় করাকে প্রাধান্য দিতে পারে। বিশ্বের দক্ষিণে শৌচাগারের চেয়ে অচিরেই মোবাইলের সংখ্যা হবে বেশি, তাই ব্যক্তিগত পছন্দ একটা প্রকৃত বিষয়।

পানি প্রকল্পগুলো স্থিতিশীল নয় কেন? বাস্তবতা হলো, সব পানি প্রকল্পের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ তিন বছর পর চালু থাকে না। এর কারণ অনেক। পানি প্রকল্পে জনগণের চাওয়া এবং এভাবে এসব সম্পদ ব্যয়ে তাদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক কী হতে পারে তা কেউ কখনো গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন? পরিবর্তন সাধন এবং এসব বিষয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কার উৎসাহ রয়েছে? ব্লক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উৎসাহ কার? চাবিকাঠি কার হাতে, ক্ষমতার? একটি প্রকল্পের কাজ করা কি স্থানীয় রাজনীতির পরিবর্তন বা সূচনার ওপর নির্ভর করে? বিশেষ করে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মূল্য নির্ধারণ করার রাজনীতির কী সমাধান হয়েছে? কোনো জাতিগত বিষয় বা মেষপালক/খামারির সংঘাত রয়েছে কি? এসব বিষয় নিয়ে কথাবার্তায় কোনো সমাজ বা বস্তি সংগঠনের অংশগ্রহণ রয়েছে কি? নারী কি পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, নাকি তাকে বর্জন করা হয়েছে, না সুযোগ দেয়া হয়েছে। জাতিসংঘের দুটি সংস্থা ২২ মার্চ ২০১২ সালে বিশ্ব পানি দিবসে ঘোষণা করেছে যে, BRICS দেশগুলো : ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বহুলাংশে বিনিয়োগের ফলে বিশ্বে খাবার পানি বিষয়ক এমডিজি লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। এটা একটা সুসংবাদ। স্থানীয় পর্যায়ে যা বিদ্যমান তার চেয়ে এটা একটা ভালো চিত্র তুলে ধরে। আর কথাটি বলেছেন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত যৌথ পরিবীক্ষণ কর্মসূচির চেয়ার এবং ইউএনএসজিএবির সদস্য জেরারড পায়েন। এখন যা সাড়ম্বরে তুলে ধরা হচ্ছে তা হলো, সম্মিলিতভাবে উন্নত পানির উৎসের স্থিতিশীল সুযোগবঞ্চিত লোকের সংখ্যা বিশ্ব অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে, আর সরকারগুলোর অনুমোদন করা এমডিজির লক্ষ্য ছিল নিরাপদ খাবার পানির স্থিতিশীল সুযোগবঞ্চিত লোকের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা। বিশ্বের শতকরা অন্তত ১১ ভাগ অর্থাৎ ৭৮ কোটি ৩০ লাখ লোক এখনো নিরাপদ খাবার পানির সুযোগবঞ্চিত রয়েছে। স্যানিটেশনের অবস্থান এই পরিসংখ্যানের অনেক পেছনে।

ভালো পানি ব্যবস্থাপনা সংবলিত নগর

নগরগুলো প্রবৃদ্ধির বাহন। তবে নগরে দারিদ্র্যের হার যেমন উচ্চ, তেমনি পরিসেবা ব্যবস্থার হারও নিম্ন। নগরের পুঁজি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি। রিও+২০-এর জন্য ২০১১ সালের বন সংযোগ সম্মেলন থেকে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক

নীতিগত সুপারিশ দেয়া হয়েছে। বন সংযোগ সম্মেলনের উপদেষ্টা বোর্ডে আমি ছিলাম। সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে :

- নগর পানি ব্যবস্থাপনা ও কৃষির মধ্যে মিথস্ক্রিয়া চিহ্নিত করার মতো ধারণামূলক কাঠামো ও পরিকল্পনা গড়ে তোলা এবং বাস্তবায়নের উপযোগী একটি পরিবেশ তৈরি করা;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানির পুনর্ব্যবহার, নগর-বহিঃসীমার কৃষি, বর্জ্যনির্ভর জ্বালানির জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা নিশ্চিত করা;
- আরো অধিক স্থিতিশীল পানি, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তার অভিঘাত অর্জন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সুস্পষ্ট জাতীয় এবং পৌর ভূমিকা ও দায়িত্ব গড়ে তোলা এবং আন্তঃখাত সহযোগিতা সুগম করা।

পানি সংযোগ

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়কে পানির জন্য খাদ্য, জ্বালানি ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে দ্রুত বর্ধমান প্রতিযোগিতা; পানি সংযোগ মোকাবেলা করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে কিছু সমস্যার সমাধান হতে পারে; কিন্তু পানি সম্পদ রক্ষা, পানির ব্যবহার সম্পর্কিত বিধিবিধান অনুসরণ, অবকাঠামোর জন্য বিনিয়োগ এবং স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনাকে বৈধতা দেয়ার লক্ষ্যে পানি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সঙ্গতিপূর্ণ নীতি তৈরির উদ্দেশ্যে একগুচ্ছ আইন গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ের উদ্যোগে স্থানীয় পর্যায়ের অগ্রগতি ব্যাহত বা জোরদার হতে পারে।

বন সম্মেলনে নির্ধারিত জাতীয় পর্যায়ে করণীয় কাজগুলো ব্যাপক ও নিরুৎসাহব্যঞ্জক হলেও জাতীয় উদ্দেশ্য অর্জন ও স্থানীয় কার্যব্যবস্থা সুগম করার জন্য তা অপরিহার্য :

- নীতি কাঠামো নির্ধারণ করা;
- বাজার নিয়ন্ত্রণ ও অনুকূল পরিবেশের ব্যবস্থা করা;
- দরিদ্রতম লোকদের জন্য খাদ্য, পুষ্টি, পানি, স্যানিটেশন ও জ্বালানির সুযোগ সুগম এবং এগুলোতে অর্থায়ন করা;
- জনগণের পানি, খাদ্য ও জ্বালানির অধিকার অর্জনে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা;
- প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত প্রতিবন্ধকতা নিরূপণ করা;
- সংযোগ সুযোগের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য একটি করে রোডম্যাপ তৈরি করা;
- নীতি বিষয়ক সংলাপ এবং খাতগুলোর মধ্যে সঙ্গতি বিধানের জন্য একটি উপযুক্ত কাঠামো তৈরি করা;
- নিয়ন্ত্রণ, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে সঙ্গতি বিধান করা।

জাতীয়-স্থানীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে : দরিদ্রদের জন্য কল্যাণমূলক শুল্ক কাঠামো; পানি ও জ্বালানির গুরুত্বকে বিবেচনায় রাখে এমন জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি কৌশল, বর্জ্য পানির পুনর্ব্যবহার ও পানি প্রক্রিয়াজাত করার একটা সংস্কৃতি গড়ে তোলা; ভূমি শাসন জোরদার করা এবং দরিদ্রদের জৈব জ্বালানি কার্যকর ব্যবহারের সুবিধার্থে ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাকে সংযুক্ত করা; পানি ও জ্বালানি সঞ্চয় এবং রাজস্ববিহীন পানি ও বিদ্যুৎ হ্রাস; ভূগর্ভস্থ পানির স্থিতিশীল ব্যবহার; উপকূল ও লবণাক্ত অঞ্চলে লোনাসহিষ্ণু খাদ্যশস্য, গবাদিপশুর খাদ্য ও জৈব জ্বালানির ব্যবহার; প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঝুঁকি হ্রাস এবং পানি ও স্থলভাগের দূষণ পদার্থ হ্রাস করা।

এটি একটি নিরুৎসাহব্যঞ্জক কাজ হলেও সহযোগিতার মাধ্যমে তা সম্পাদনযোগ্য।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী

১২ আগস্ট ২০১২

আজকের তরুণ প্রজন্ম-বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম অংশ হিসেবে যাদের পরিচিতি এবং যাদের সবচেয়ে বড় অংশ উন্নয়নশীল দেশে বসবাস করে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে তাদের মধ্যে রয়েছে অভূতপূর্ব সম্ভাবনা। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতসহ অসংখ্য তরুণ নিম্ন বেতন, হাড়ভাঙা পরিশ্রম এবং রেকর্ড পরিমাণ বেকারত্ব ভোগ করছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট তাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং তাদের অনেকেই ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের কারণে বোধগম্যভাবে নিরুৎসাহিত হচ্ছে। এদের বৃহৎ অংশের তাৎক্ষণিক কোনো সুযোগ নেই এবং এরা নিজ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত। জরুরি পদক্ষেপ না নিলে, আমরা অসংখ্য মেধা ও স্বপ্নের 'হারানো প্রজন্ম' সৃষ্টির ঝুঁকিতে রয়েছি।

তরুণদের সাথে এবং তরুণদের জন্য কাজ করা আমার অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। জনতার মঞ্চে এবং সাইবার স্পেসে তরুণরা এক ধরনের রূপান্তরযোগ্য শক্তি; তারা সৃষ্টিশীল, সম্পদশালী এবং পরিবর্তনের উদ্যমী প্রতিনিধি। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমতা অর্জনের প্রচেষ্টায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকে শুরু করে রিও+২০ জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনের সহায়তায় বৈশ্বিক সম্পৃক্ততায় তরুণরা আবারও উদ্যমের সাথে ইতিহাসের স্রোতকে উল্টে দিতে এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় তাদের সামর্থ্য ও স্পৃহা দেখিয়েছে।

তরুণ নারী ও পুরুষরা শুধুই নিষ্ক্রিয় সুবিধাভোগী নয়, বরং সমান ও কার্যকরী অংশীদার। তাদের আকাঙ্ক্ষা চাকরির চেয়েও বড়; তরুণরা নীতিনির্ধারণে অংশীদার হতে চায়; চায় তাদের মতামতকে প্রাধান্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনকে গড়ে তুলতে। তরুণদের কথা শোনা ও তাদের সাথে আমাদের সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন। তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আমাদের আরও বেশি ও শক্তিশালী কার্যকৌশল প্রতিষ্ঠা করা দরকার। সময় এসেছে তরুণদের কণ্ঠস্বরকে অর্থপূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকল পর্যায়ে সম্পৃক্ত করার।

সারা বিশ্বে তরুণদের সম্পৃক্ত করে নীতি ও বিনিয়োগে

আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি বাড়ছে। আজকের এই আন্তর্জাতিক যুব দিবসে, আমি সরকার, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তরুণদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করতে এবং তরুণ নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সংগঠনের সাথে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির আহ্বান জানাই। তরুণরাই নির্ধারণ করতে পারে যে এই যুগ আরও ঝুঁকির দিকে অগ্রসর হবে, নাকি ইতিবাচক কোনো পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাবে। আসুন আমরা আমাদের বিশ্বের তরুণদের সমর্থন করি, যাতে তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে আরও বেশি উৎপাদনশীল ও শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রজন্ম তৈরি করতে পারে।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স : ৯১৮৩১০৬ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: Kazi Ali Reza, Phone: 9183086 Fax: 9183106 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org